"অপবিত্রজন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা !"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেঘ ও রৌদ্র

গল্পটি সকলেই জানেন। আইনে মাষ্টার ডিগ্রি নিয়ে গ্রামে ফিরে গ্রন্থের মধ্যেই ডুবে থাকতে ভালবাসত শশিভূষণ। পড়াশোনার সঙ্গী একমাত্র গিরিবালা। ভালই দিন কাটছিল। বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে যেমন শিক্ষিত মানুষের নিরুপদ্রব দিন কাটে। বাদ সাধল সাহেবদের খেয়াল খুশির অমানবিক আচরণ। সংসার অনভিজ্ঞ হুইশেল ব্লোয়ার শশী জড়িয়ে গেল এমন সব কাণ্ডে যে শেষ পর্যন্ত তাকে জেলে যেতে হল ৫ বছরের জন্য। ততদিনে একমাত্র গুণমুগ্ধাও বাল্যবিবাহের শিকার।

উদ্ধৃত অংশটির বক্তা গিরিবালার বাবা হরকুমার। আমাদের নায়ক শশী পীড়িত প্রজাগণের হয়ে সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকলে সাহেব হরকুমারকে ডেকে পাঠান। তখন শশী ও তাঁর প্রজাদের সম্পর্কে এমত বাক্য ব্যবহার করেছেন পত্তনিদার হরকুমার। নবারুণ ভট্টাচার্য হইলে লিখিতেন, 'শুয়োরের বাচ্চাদের হাড়ে এত তেজ হয়েচে।' এহ বাহ্য।

গ্রামে তিন দশক জীবন কাটাবার সূত্রে এই বিশেষ গালাগালটির সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেকবার। রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে, ভিটে সংক্রান্ত ঝগড়ায়, জমি সংক্রান্ত বিবাদে, প্রতিবেশীর ঈর্ষায়, মাচা'র (চণ্ডীমণ্ডপ) আলোচনায় আমার বাপ ঠাকুরদার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে আজও বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়। সামান্য এক মাতাল চাষির ছেলে হয়ে আমার বাবা স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন 'ঘোড়ার পাতা' পেরিয়ে দর্শনে মাষ্টার ডিগ্রী অর্জনের। বিয়ের পরে মা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যায় গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে সে বিষয়ে গ্রামে প্রথম নজির রাখতেও স্পর্ধা লাগে বইকি। তার চেয়েও বড় স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন গ্রামে থেকে হুইশেল ব্লোয়ারের ভূমিকা পালনে। হ্যাঁ, ১৯৭০-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বাবা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বর্গা রেকর্ড, শ্রমিকের মাহিনা বৃদ্ধি, নতুন রাস্তা নির্মাণ, মজুরের আত্মসম্মান উদ্ধারে ভূমিকা পালন করার পর, ধানের জমিতে ওষুধ স্প্রে করে, আলুর ক্ষেতের ভিতে কেটে বাবা কলকাতা চলে যেত

এ জি বেঙ্গলে সার্ভিস করতে। আর মা-দাদা-দাদু ঐ বিশেষ গালাগালটি সারাদিন শুনতে বাধ্য হতেন। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক থেকে কংগ্রেস পন্থী গ্রামবাসীরা খুনের হুমকি পর্যন্ত দিতেন বাড়ির দোরগোড়ায় এসে। যে অংশটির সঙ্গে ছিল শ্রেণিগত মিল, শিক্ষা অর্জনের কারণে তাদের দলের হরকুমারদের চোখে বাবা তখন শ্রেণীচ্যুত। জ্ঞানত বাবাকে পার্টির কাজ করতে দেখিনি, ৩০ বছর আগেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়। আমাদের বইয়ের আলমারির দুটো তাকে এখনো শোভা পায় ইংরেজি ও বাংলায় লেখা মার্কস–এঙ্গেলস রচনাবলী। লেনিনের নির্বাচিত রচনা। কান্টের ক্রিটিক অফ পিওর রিসিন, গ্রিক ফিলসফি, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রুথ অ্যান্ড লজিক, রোডস টু হ্যাপিনেস ইত্যাদি গ্রন্থগুলো এই গ্রামে বসেই লম্ফের আলোয় পড়তে অনেক শশিভূষণের মতই হাড়ের তেজ লাগে। এখানে এই অন্ধকারে থেকে যেতেও লাগে হিম্মত। গ্রামের এক কোণে নিরিবিলিতে ১৯৯২ সালে আমাদের একটা পাকা বাড়ি হয়। '৯২ সাল পর্যন্ত একটা ঘরেই আমাদের চারজনের জীবন কেটেছে। এইখানে থেকেই আমরা দুই ভাই ইউনিভার্সিটির দোরগোড়া দিয়ে উচ্চশিক্ষার শেষ তলা পর্যন্ত উঠতে পেরেছি। জমির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখন প্রায় নেই। বাবাই দেখাশোনা করে। সেদিন তলস্তয় সম্পর্কে পড়ছিলাম, তলস্তয় বুদ্ধিজীবীকে চাষি বানাতে চেয়েছিলেন। আমার কথাটা নতুন লাগেনি, কারণ আমি আমার বাবাকে দেখেছি। বাবা একজন চাষিই থেকে গেল। বুদ্ধিজীবী হওয়ার চেষ্টা করেনি।

ভূমিকাটা একটু বড় হয়ে গেল, কেন এই লেখা লিখতে বসা বলি। ইদানিং ভিটে আর জমি সংক্রান্ত পারিবারিক বিবাদে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে সংসারের নিয়মে। সেইসঙ্গে একটি নতুন বিশেষণ আমাদের জন্য ব্যাঙ্গার্থে প্রযুক্ত হয়, 'শিক্ষিত হয়েছে!' হরকুমারের দেওয়া ঐ পুরাতন গালাগালটি আর সামনে দেওয়ার যুগ নেই। তাই হয়ত উল্টো পুরাণ। মানুষ সম্পর্কে বাবা-মায়ের বিশ্বাসও ক্রমে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এমন নয় যে শুভানুধ্যায়ী নেই, এমন নয় যে আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ানোর লোক নেই। কিন্তু মানুষের সম্পর্কের একটা বড় আশ্রয় রক্তের সম্পর্ক। মা বাবা তাঁদের জীবন দিয়ে দেখে শাস্ত্র প্রণেতাদের সঙ্গে একমত হল, 'স্বভাব যায় না মলে'। একমত হলেও নিজের শ্রেণিতে থেকে যাওয়ার জন্য আফসোস করে না ওরা। তবে আর গ্রামে

ফেরার আবেদনও করে না। আমার সংগ্রহের জেমস লঙের তিন খণ্ডের ‘প্রবাদ মালা’ পড়তে দেখি আজকাল মা বাবাকে। তাই নিয়ে হাসাহাসিও হয়।

এখন আমার এইখানেই ঘোষেদের পুকুর পাড়ের তালতলার বাড়িতে ফিরে এসে বসবাসের সময় ঘনিয়ে এল। ২০০৩ এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলুম এম এ পড়তে। মাঝখানে ২০০৭ টা গ্রামেই কেটেছিল। তখন লাইব্রেরী নিয়ে মেতে থাকতুম। তারপর স্কুলের চাকরি নিয়ে প্রবাসে দৈবের বশে কাটছে শান্তিনিকেতনে। ২০১৬ য় আবার গ্রামেই ফিরে আসব এমন একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে নিয়েই ফেলেছি। রবিবাবুর গল্পর নায়কের মত লাঞ্ছনার অবকাশ আছে সন্দেহ নেই। “ শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না —কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।” তবে মানিকবাবুর শশীর মত দুঃখ আমার হয় না। উঁচু টিলায় উঠে সূর্যাস্ত দেখার সাধ হয়। ফটোগ্রাফির নেশা আছে যে! দুই চারজন ভালো বন্ধু আছে গ্রামে। শ-খানেক ক্লাসিক সিনেমা আছে সংগ্রহে। আর আছে বিশ্ব সাহিত্য সংগ্রহ। কয়েকজন ভক্ত আছে যারা গরমের ছুটি পড়লে মনে করে ছোটদের নাটক করাতে হবে বলে ডেকে নিয়ে যায়। কয়েকজন বন্ধু আছে যাদের কাছে গেলে অনেক দিনের পুঁজি নিয়ে ঘরে ফেরা যায়। “I kept on telling myself that no place is good or bad but it depends what you make out of that place and people are integral part of making a place worth living in.”

হুইশেল ব্লোয়ার হওয়ার সাধ আমার নেই। প্রয়োজন হইলে শশিভূষণ দেশীয় সাহেবদিগের অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস আপডেট লিখিবে ফেসবুকে। হরকুমাররা তো থাকিবেই। শুধু সেই সেদিনের গিরিবালা থাকিলে জীবনের দশম পরিচ্ছেদটা মন্দ হইত না।